

ঋণমানের স্থিতিশীলতা কতটুকু টেকসই

বাংলাদেশের ঋণমান আপাতত আর নিচে নামছে না। আন্তর্জাতিক রেটিং যাচাইকারী সংস্থা Moody's-এর Stable outlook-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা সম্ভবত এখানেই। একটি দেশের অর্থনীতির শক্তি শুধু জিডিপি, মাথাপিছু আয়, রিজার্ভ বা রপ্তানি বৃদ্ধির হিসাব দিয়ে বোঝা যায় না। অর্থনৈতিক সক্ষমতা কতটা টেকসই, তা বুঝতে হলে দেখতে হয় রাষ্ট্র তার ঋণ কতটা স্বচ্ছন্দে পরিশোধ করতে পারে, ব্যাংকিং খাত কতটা স্থিতিশীল, সরকারের রাজস্ব ভিত্তি কতটা মজবুত এবং বৈদেশিক অভিজাত এলে অর্থনীতি কতটা দ্রুত তা সামলে উঠতে পারে। এসব সূচক ও সক্ষমতার ওপরই একটি দেশের ঋণমান অনেকাংশে নির্ভর করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই Moody's-এর সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তটি গুরুত্বপূর্ণ। গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ সংস্থাটি বাংলাদেশের সার্বভৌম ঋণমানের পূর্বাভাস 'নেতিবাচক' থেকে উন্নত করে 'স্থিতিশীল' ঘোষণা করেছে। মূল ঋণমান 'বি২' রাখা হয়েছে। অর্থাৎ এটি কোনো রেটিং আপগ্রেড নয়, বরং বাংলাদেশের ঋণমান আরও অবনমনের ঝুঁকি আপাতত কিছুটা কমেছে।

অপরদিকে, আন্তর্জাতিক রেটিং যাচাইকারী সংস্থা ফিচ (Fitch) মে, ২০২৬-এ বাংলাদেশের আউটলুক 'স্থিতিশীল' থেকে 'নেতিবাচক' করেছে এবং এসঅ্যান্ডপি (S&P) গ্লোবাল রেটিংসে জুলাইয়ে একইভাবে আউটলুক 'নেতিবাচক' করেছে। এসঅ্যান্ডপি উভয় ক্ষেত্রেই B+ (বি+) রেটিং বহাল রয়েছে। এই ভিন্ন আউটলুক মিলিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি দ্বিমুখী চিত্র পাওয়া যায় যেখানে পুনরুদ্ধারের কিছু দৃশ্যমান লক্ষণ আছে, কিন্তু কাঠামোগত দুর্বলতা এখনো গভীর। মুডিস-এর চোখে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের বৈদেশিক অবস্থান কিছুটা শক্তিশালী হয়েছে। এসব পরিবর্তন বৈদেশিক চাপ মোকাবিলায় বাংলাদেশের সক্ষমতা বাড়িয়েছে।

একটি দেশের ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা শুধু ঋণের পরিমাণ দিয়ে নির্ধারিত হয় না, বৈদেশিক মুদ্রার সক্ষমতাও গুরুত্বপূর্ণ। রিজার্ভ শক্তিশালী থাকলে আমদানি, জ্বালানি ব্যয় কিংবা বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের চাপ সামলানোর জন্য সরকারের হাতে তুলনামূলক বেশি সুযোগ থাকে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রেমিট্যান্স প্রবাহও তাই শুধু প্রবাসী আয়ের সুখবর নয়, এটি দেশের বৈদেশিক ঋণমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। কিন্তু এখানেই দ্বিতীয় প্রশ্নটি আসে। রিজার্ভ বেড়েছে, রেমিট্যান্স বেড়েছে, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তাও কিছুটা কমেছে—তাহলে রেটিং B2 (বি২)-তে কেন? কারণ রেটিং সংস্থাগুলো শুধু আজকের বৈদেশিক অবস্থান দেখে না, আগামী দিনের ঋণ পরিশোধের সক্ষমতাও বিবেচনায় নেয়। আর এখানে বাংলাদেশের সামনে বড় পরীক্ষাগুলো রয়ে গেছে। মুডিস-এর ভাষায়, বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য

কাঠামোগত দুর্বলতা এখনো বিদ্যমান। বিশেষ করে ব্যাংকিং খাতে দীর্ঘদিনের খেলাপি ঋণ ব্যাংকগুলোর আর্থিক সক্ষমতার ওপর চাপ তৈরি করেছে।

উন্নয়নশীল প্রায় সব দেশই ঋণ নেয়। আসল প্রশ্ন হলো, রাষ্ট্রের আয় কত এবং সেই আয়ের কত অংশ ঋণ পরিশোধে চলে যায়। বাংলাদেশের সরকারি রাজস্বভিত্তি তুলনামূলকভাবে সংকীর্ণ হওয়ায় এই জায়গাটি দীর্ঘমেয়াদে বড় চ্যালেঞ্জ। মুডিস-এর মূল্যায়নে বাংলাদেশের রাজস্ব সক্ষমতা দুর্বল হওয়ার পেছনে রাজস্ব আহরণের সীমিত ভিত্তি এবং ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ। ফলে মুডিস-এর স্থিতিশীল (Stable) আউটলুক মানে তাৎক্ষণিক অবনতির ঝুঁকি আপাতত কিছুটা কমেছে কিন্তু কাঠামোগত সংস্কারের প্রয়োজন শেষ হয়নি। এখানেই এসঅ্যান্ডপি ও ফিচ-এর সঙ্গে পার্থক্যটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এসঅ্যান্ডপি জুলাইয়ে বাংলাদেশের আউটলুক নেগেটিভ করার সময় ব্যাংকিং খাতের দুর্বলতা, অর্থনৈতিক গতি মস্তুর হওয়ার ঝুঁকি, জ্বালানি বাজারের অস্থিরতা এবং বৈদেশিক বাণিজ্য পরিস্থিতির ঝুঁকির কথা সামনে এনেছে। এসঅ্যান্ডপি-এর বিশ্লেষণে চলমান জ্বালানি বাজারের চাপ দীর্ঘস্থায়ী হলে বাংলাদেশের বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যের ওপরও চাপ তৈরি হতে পারে। এক্ষেত্রে ফিচও মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত এবং বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারের অস্থিরতার প্রতি বাংলাদেশের অতি নির্ভরশীলতাকে ঝুঁকি হিসেবে দেখেছে। তাহলে কারা ঠিক, মুডিস, নাকি ফিচ ও এসঅ্যান্ডপি? তিনটি সংস্থার মূল্যায়নে বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিন্ন ভিন্ন ঝুঁকি উঠে এসেছে। তবে, মুডিস-এর মতে সাম্প্রতিক বৈদেশিক ও রাজনৈতিক চাপ কিছুটা কমেছে, অন্যদিকে এসঅ্যান্ডপি ও ফিচের মূল্যায়নে দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক ঝুঁকি এবং বৈদেশিক খাতের দুর্বলতা বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এখন একই সঙ্গে দুটি প্রসঙ্গ এসেছে। একটি পুনরুদ্ধারের অর্থনীতি যেখানে রিজার্ভ বেড়েছে, রেমিট্যান্স শক্তিশালী হয়েছে এবং বিনিময় হার ব্যবস্থায় নমনীয়তা এসেছে। অন্যটি ঝুঁকি বিষয়ক যেখানে ব্যাংকিং খাতের দুর্বলতা, সংকীর্ণ রাজস্ব ভিত্তি, ঋণ পরিশোধের চাপ এবং বৈশ্বিক জ্বালানি ও বাণিজ্য পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা এখনো রয়ে গেছে। প্রথমটি বাংলাদেশকে স্বস্তি দিচ্ছে, দ্বিতীয়টি এখনো সতর্ক করছে। এই দুই প্রবণতার ভারসাম্য শেষ পর্যন্ত নির্ভর করবে নীতি ও সংস্কারের গতির ওপর। এখন প্রশ্ন হলো, এই স্বস্তিকে কীভাবে টেকসই করা হবে। এর উত্তর শুধু বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ব্যাংকিং খাতের খেলাপি ঋণ কমানো, দুর্বল ব্যাংকগুলোর আর্থিক ভিত্তি শক্তিশালী করা, সুশাসন নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনীয় মূলধন পুনর্গঠন করতে হবে। একই সঙ্গে রাজস্ব আহরণের সক্ষমতা বাড়াতে হবে, যাতে সরকারের ঋণ পরিশোধের চাপ সামলানোর নিজস্ব সক্ষমতা বাড়ে। এর সঙ্গে বিনিয়োগ পরিবেশ ও নীতির ধারাবাহিকতাও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একটি দেশের আর্থিক বিশ্বস্ততা শুধু তার আর্থিক হিসাবের ওপর নির্ভর করে না, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো কতটা কার্যকর এবং সংকটে রাষ্ট্র কতটা দ্রুত ও দক্ষতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, সেটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

সংস্কারের গতি থেমে গেলে বা ব্যাংকিং ও বৈদেশিক ঝুঁকি আরও বাড়লে ভবিষ্যতে পূর্বাভাসের ওপর আবারও নেতিবাচক চাপ তৈরি হতে পারে। তাই মুডিস-এর 'স্থিতিশীল'কে বাংলাদেশের অর্থনীতির গন্তব্য হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। এটি বরং অবনতির চাপ থেকে সাময়িক বেরিয়ে আসার একটি পর্যায়।

আজকের রিজার্ভ ও রেমিট্যান্স বাংলাদেশের বৈদেশিক লেনদেনে কিছুটা স্থিতিশীলতা এনেছে। এখন সেই স্থিতিশীলতাকে সংস্কারে পরিণত করার পালা। এছাড়াও ব্যাংকিং খাত কতটা সক্ষম হয়, রাজস্বভিত্তি কতটা বিস্তৃত হয়, বিনিয়োগ পরিবেশ কতটা স্থিতিশীল হয় এবং বৈদেশিক অভিজাত মোকাবিলার সক্ষমতা কতটা বাড়ায় তার ওপরই নির্ভর করবে বাংলাদেশের পরবর্তী ঋণমানের গতিপথ। তাই বাংলাদেশের জন্য আসল প্রশ্ন স্থিতিশীল পাওয়া নয়। আসল প্রশ্ন হলো, এই স্থিতিশীল- এর ভিত্তি কতটা শক্ত করা যায়। কারণ একটি দেশের আর্থিক বিশ্বস্ততা শুধু তার আর্থিক হিসাবের ওপর নির্ভর করে না, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো কতটা কার্যকর এবং সংকটে রাষ্ট্র কতটা দ্রুত ও দক্ষতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, সেটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

লেখক:

অঞ্জন কুমার রায়, ব্যাংকার